রাশিয়ার এক প্রান্তে

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ মস্কো থেকে চিঠি লিখেছিলেন, "রাশিয়ায় এসেছি— না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যা কাণ্ড করছে তার ভালোমন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্ব প্রথমেই মনে হয়, কী অসম্ভব সাহস।"[১] একুশ বছর পরে মস্কোতে বেড়াতে এসে যা দেখি তাতেই রবীন্দ্রনাথের সেই কথা মনে পড়ে, বারে বারে ভাবি এদের কী অসীম সাহস।

রাশিয়ায় বিপ্লব হল ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে। প্রথম পাঁচ বছর গেল বাইরের শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে। তাদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার পরে ১৯২২ সাল থেকে এরা ঘরের কাজে মন দিতে পারলে। কুড়ি বছর যেতে না যেতেই ১৯৪১ সালে জার্মানরা আবার এদের আক্রমণ করে। আরো চার-পাঁচ বছর গেল জীবনমৃত্যুর দোলায়মান সংগ্রামে। তার পরে সবে বছর পাঁচেক সময় পেয়েছে যুদ্ধের সমস্ত ক্ষতি মিটিয়ে ফেলে অগ্রসর হওয়ার জন্যে। বিপ্লবের পরে এরা যা-কিছু করেছে সবই আসলে বিশ-পঁচিশ বছরের কাজ।

এদের সমস্ত চেষ্টা ও উদ্যোগের একটা বিরাট ও সমগ্র রূপ দেখতে পেলেম মস্কোর চেয়েও স্পষ্টভাবে কাজাকস্থানের রাজধানী আল্মা-আতায়। গত সপ্তাহে সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলুম। মস্কো থেকে অনেক দূর, আড়াই হাজার মাইল হবে। উড়ে যেতেও সময় লাগল একুশ ঘণ্টা। আল্মা-আতা ভারতবর্ষেরই কাছে; কাশ্মীরের গায়ে লাগা, আর চীনদেশের পশ্চিম সীমান্তে। দিল্লী-আগ্রার ঠিক সোজা উত্তর দিকে, হিমালয় আর আল্‌তাই পর্বতশ্রেণীর অপর পারে।

কাজাক দেশটা পাহাড়ে জায়গা। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে এই দেশের লোকেরা ছিল খুব একটা পিছিয়ে-পড়া জাত। এক শ জনের মধ্যে তখন মোটে দু জন লেখাপড়া জানত। আধুনিক কোনো ব্যবস্থা, যেমন হাসপাতাল থিয়েটার বিশ্ববিদ্যালয়, কোনো কিছুরই চিহ্ন ছিল না।

কাজাকরা হল একেবারে খাঁটি এশিয়াবাসী। এদের ভাষাও রুশ-ভাষার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বিপ্লবের আগে রাশিয়ার সম্রাট জারের গবর্নমেণ্ট এদের সব দিক দিয়ে দাবিয়ে রেখেছিল। এদের জন্য কিছুই করে নি। শুধু শোষণ করেছে।

আল্মা-আতায় এসে দেখলুম, এখানকার লোকেরা অনেকটা আমাদের দেশের পাহাড়ীদেরই মতো দেখতে। গায়ের রং কারো ফরসা, কারো বাদামী, কারো রীতিমতো কালো। মনে হয় যেন খাসিয়া ভুটিয়া নেপালীরা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ধরন-ধারণও অনেকটা সেই রকমের। অনেককে দেখতে ভারতবাসী, এমনকি কাউকে কাউকে একেবারে বাঙালি বলেই ভুল হয়। বিপ্লবের আগে এরা সত্যিই ছিল আমাদের দেশের পিছিয়ে-পড়া জাতের মতো— যাদের আমরা অনেক সময়ে বলি অর্ধ-সভ্য। আল্মা-আতা ছিল একটা ছোটো শহর; আমাদের দেশের চেয়েও গরিব, রাস্তাঘাট আরো খারাপ, ছোটো ছোটো

১ রাশিয়ার চিঠি। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

মাটির কুঁড়ে ঘর। এখনো তার কিছু কিছু নমুনা আমরা পথে যেতে যেতে দেখেছি। বিপ্লবের আগে দশ-বিশ হাজার লোক এখানে বাস করত।

আজ গিয়ে দেখলুম চমৎকার একটা আধুনিক শহর, লোকসংখ্যা চার লক্ষ। সুন্দর চওড়া রাস্তা, দুই ধারে লম্বা এক-এক ফালি ফুলের বাগান, তার পাশে পায়ে-চলা পথ। তার পরে এক সারি উঁচু গাছ, সমস্ত রাস্তাটাকে ছায়ায় ঢেকে রেখেছে। তার পরে এক-একটা বাড়ি। প্রত্যেকটি বাড়ির সঙ্গেই অল্প একটু জমি আর ফলফুলের বাগান। একটা নয়, শহরের নতুন সব রাস্তাই এই রকম। ওরা বললে যে, নতুন শহর সমস্ত রাশিয়া জুড়ে এইভাবেই তৈরি হচ্ছে। ওদের ইচ্ছা সব জায়গায়ই সবুজ শহর গড়ে তোলা।

সব রাস্তাতেই বিজলি-বাতি। তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, কারণ শুধু শহরে নয়, রাশিয়ার প্রত্যেকটি গ্রামে— একটাও বাদ নেই— এরা বৈদ্যুতিক শক্তি পৌঁছিয়ে দিয়েছে। শহরে নতুন বাড়ি অনেক তৈরি হয়েছে, দোতলা বা তিনতলা। এদেশে ভূমিকম্প হয়ে থাকে, তাই বেশি উঁচু বাড়ি তোলা নিরাপদ নয়। মাঝে মাঝে সাবেক আমলের ছোটো ছোটো বাড়ি-ঘরও আছে। তার মধ্যে অনেক মাটির বাড়ি।

জমির মালিক হয় শহরের মুনিসিপালিটি অথবা কাজাকস্থানের গবর্নমেণ্ট। প্ল্যান করে কাজ করবার কোনো বাধা নেই। শহরের মাঝে মাঝে সুন্দর ফুলের বাগান, ফুলগুলি সব আমাদের দেশেরই মতো। ছোটো একটা নদীর ধারে প্রকাণ্ড একটা বাগান দেড় মাইল দুই মাইল লম্বা। তার মধ্যে নানারকম খেলাধুলার ব্যবস্থা, সিনেমা, অনেক রকম খাবারের দোকান— সবই অবশ্য সরকারী— আর একটা প্রকাণ্ড হ্রদ। গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলা তিন হাজার ফুট উঁচুতে খানিকটা কালিম্পঙ-কার্সিয়াঙের মত। বাগান জুড়ে হাজার হাজার বাচ্চা ছেলেমেয়ে অধিকাংশই খালি গায়ে খেলা করে বেড়াচ্ছে। সকলেরই মুখে হাসি।

আল্‌মা-আতা শহরের পাড়ায় পাড়ায় বিদ্যালয়। শহরে ৬ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত, আর গ্রামে ৬ থেকে ১৩ বছর পর্যন্ত সকলকেই বিদ্যালয়ে পড়তে হয়, তার জন্য কোনো মাহিনা দিতে হয় না। যে জাতটার মধ্যে বিপ্লবের সময়ে শতকরা মোটে দু জন লেখাপড়া জানত, ১৯৪১ সালে তাদের মধ্যে একজনও নিরক্ষর রইল না। কুড়ি বছরের মধ্যে শতকরা এক শ জনকে লেখাপড়া শিখিয়ে দিলে।

দেখতে গিয়েছিলুম আল্‌মা-আতা বিশ্ববিদ্যালয়। এদেশে ষোলো বছর বয়সের পরে অধিকাংশ ছেলেই যায় নানারকম টেক্‌নিক্যাল স্কুলে। সাধারণ শিক্ষার জন্য যাদের বিশেষ যোগ্যতা আছে, প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল অনুসারে বাছাই করে নিয়ে শুধু তাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। আল্‌মা-আতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুনলুম ছাত্রসংখ্যা এখন তিন হাজার, আর শিক্ষকমণ্ডলী তিন শ, তার মধ্যে অর্ধেক কাজাকদেশের লোক। এখানে বলে দেওয়া ভালো যে, সমস্ত কাজাকস্থানের লোক-সংখ্যা হল ষাট লক্ষ, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যার চার ভাগের এক ভাগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগও আছে। এ ছাড়া কাজাকদেশে পঁচিশ-ছাব্বিশটি টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউশন আছে, তাতে ছাত্রসংখ্যা ষোলো হাজার। বিদ্যালয় আছে নয় হাজার, আর তাতে ছাত্রসংখ্যা দশ লক্ষ।

এসব বাদেও আছে সংগীত ও অন্যান্য ললিতকলা শেখবার জন্য প্রতিষ্ঠান। আল্‌মা-আতায় সংগীত-বিদ্যালয় দেখলুম— কন্‌সারভেটোয়ার, তার ছাত্রসংখ্যা তিন হাজার।

আমি ইচ্ছা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যার (Physics আর Chemistryর) ল্যাবরেটরি দেখতে গিয়েছিলুম। যন্ত্রপাতি যা দেখলুম তা কোনো বিষয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের চেয়ে খারাপ নয়, বরং ভালো।

এই হল বিশ্ববিদ্যালয়। তার পরে দেখতে গেলুম Academy of Sciences। ভারতবর্ষে এরকম কোনো জিনিস নেই, এর নাম দেওয়া যেতে পারে বিদ্যা-আয়তন। রাশিয়াতে সায়ান্স বললে ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র দর্শন বা সাহিত্য সবই বোঝায়। সব রকম বিদ্যাচর্চা ও গবেষণার ব্যবস্থা এই অ্যাকাডেমিতে। অ্যাকাডেমির অনেকগুলি ইনস্টিটিউট আছে অর্থাৎ গবেষণার জায়গা। সব জড়িয়ে অ্যাকাডেমিতে হাজার লোক কাজ করে। তা ছাড়া পাঁচ শ জন ছাত্র এম্. এ. বা এম্. এসসি. পরীক্ষার জন্য থিসিস্ তৈরি করছে। অ্যাকাডেমির জন্য এই বছরের বাজেটে মঞ্জুর হয়েছে পাঁচ কোটি রুব্‌ল— প্রায় ছয় কোটি টাকা। এখন অ্যাকাডেমির সভ্য তিরিশ জন, তার মধ্যে ষোলো জন কাজাক-দেশীয়। আর সভাপতি একজন বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিৎ, নাম সাৎপায়েভ্। তিনি নিজে কাজাকী, ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে কাজাকদেশের প্রথম গ্রাজুয়েট। বিদ্যা-আয়তনের মধ্যে একজন আছেন মহিলা-সভ্য।

এই হল শিক্ষার ব্যবস্থা। মনে পড়ল, রাশিয়ার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কথা: "রাশিয়ায় এসে একটা বিরাট চিত্তের স্পর্শ পাওয়া গেল। শিক্ষার বিরাট পর্ব আর কোনো দেশে এমন করে দেখি নি, তার কারণ অন্য দেশে শিক্ষা যে করে শিক্ষার ফল তারই— দুধু ভাতু খায় সেই। এখানে প্রত্যেকের শিক্ষায় সকলের শিক্ষা। একজনের মধ্যে শিক্ষার যে অভাব হবে সে অভাব সকলকেই লাগবে। কেননা সম্মিলিত শিক্ষারই যোগে এরা সম্মিলিত মনকে বিশ্বসাধারণের কাজে সফল করতে চায়। এরা 'বিশ্বকর্মা'; অতএব এদের বিশ্বমনা হওয়া চাই। অতএব এদের জন্যেই যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়।"[২]

তার পরে আল্মা-আতায় দেখলুম হাসপাতাল, স্যানেটোরিয়ম। এক আল্মা-আতাতেই আছে দু হাজার রুগীর জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থা। তাতেও এরা সন্তুষ্ট নয়। এরা চার হাজার বেড্-এর ব্যবস্থা করবে শীঘ্রই। শহরে ছয় বছর শিখে পাশকরা ডাক্তারের সংখ্যা পাঁচ শ। সমস্ত রাশিয়াতে এখন প্রতি আট শ জন লোকের জন্য একজন ডাক্তার। ওদের পরিকল্পনা যে আরো বাড়াতে হবে; প্রতি ছয় শ জনের চাই একজন ডাক্তার। আর প্রতি এক শ জন লোকের জন্য চাই হাসপাতালে একটা বেড্। চিকিৎসার ব্যবস্থা অবশ্য সবই বিনা পয়সায়। ডাক্তাররা সকলেই মাহিনা পান। হাসপাতাল ডিস্‌পেন্সারিতে কাজ শেষ করার পরে প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ করতে বাধা নেই, কিন্তু তা খুবই কম চলে। কারণ হাসপাতালে বিনা পয়সায় আরো অনেক ভালো চিকিৎসা লোকে করাতে পারে।

হাসপাতাল স্যানেটোরিয়ম কয়েকটা দেখলুম। খুব ভালো ব্যবস্থা। একটা পুরানো ছোটো হাসপাতাল, তাতে ১০৫টি বেড্। সেখানে কাজ করেন ৪৫ জন ডাক্তার, তার মধ্যে মোটে ৩ জন পুরুষ মানুষ। এদেশে অধিকাংশই মেয়ে-ডাক্তার। আর দেখলুম ৯৬ জন নার্স। এই ৪৫ জন ডাক্তার আউটডোর রুগীও অবশ্য দেখে থাকে, তার জন্য হাসপাতালের সঙ্গে সংলগ্ন ডিস্‌পেন্সারি বা পলিক্লিনিক আছে। ঘুরে দেখলুম ৩৯টা আলাদা আলাদা ঘর আছে এক-একজন বিশেষজ্ঞের জন্য। হাসপাতালের আসবাবপত্র, ব্যবস্থা সব কিছুই মস্কৌর হাসপাতালের মতো। কোনো তফাত নেই।

২ রাশিয়ার চিঠি। ৩ অক্টোবর ১৯৩০

স্যানেটোরিয়ম ছোটা দেখতে গিয়েছিলুম আল্‌মা-আতায় তাতে ব্যবস্থা আছে ১৮০ জন রুগীর জন্ত। ঠিক রুগী বলা যায় না, অসুখ সেরে ওঠার পরে কিংবা বিশ্রাম করার জন্তই বেশি লোকে আসে। এখানে ১০ জন ডাক্তার, সকলেই মহিলা। ব্যবস্থা আছে সব রকম। এক্স্ রে, খেলাধুলা, নানারকম স্নানের ব্যবস্থা— তাও চিকিৎসার অঙ্গ। প্রকাণ্ড খাবার-ঘর। দু শ জন একসঙ্গে খেতে বসতে পারে। নিজেদের সিনেমা-ঘর, লাইব্রেরি। আমাদের দেশে এরকম একটা স্যানেটোরিয়মও আছে বলে জানি না। এদেশে শুনলুম হাজার হাজার।

আল্‌মা-আতায় দেখলুম প্রকাণ্ড অপেরা-গৃহ, তাতে আঠারো শ লোক বসতে পারে। মস্কৌতে সব চেয়ে বড়ো বিখ্যাত বল্‌শয় (Bolshoi) থিয়েটারে লোক ধরে চব্বিশ শ। তফাত খুবই অল্প। আল্‌মা-আতায় মস্কৌর মতো একটা 'চিল্‌ড্রেন্স থিয়েটার' আছে, সেখানে বিশেষভাবে ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের জন্ত অভিনয় দেখানো হয়।

এখন জুলাই মাস। গ্রীষ্মকালে আল্‌মা-আতা থেকে এদের সব থিয়েটারের দলগুলি বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। এখানে গ্রীষ্মকালে দু-তিন মাস এক রিপাব্লিকের দল অন্ত রিপাব্লিকে তাদের অভিনয় নাচ গান শোনাতে যায়। এই ভাবে ষোলোটা রিপাব্লিকের লোক পরস্পরের জিনিসগুলি দেখতে পায়। আমরা যেমন মস্কৌতে বসে য়ুক্রেন, উরাল, উজবেকিস্তান প্রভৃতি জায়গার অভিনয় দেখলুম।

কাজাকদেশের থিয়েটারগুলি গ্রীষ্মকালে বন্ধ। তবে একদিন একটা কন্‌সার্টে গিয়েছিলুম, সেখানে কয়েকজন ভালো গাইয়ে-বাজিয়ের গান আর সংগীত শুনলুম আর কিছু কাজাকী নাচও দেখলুম। রাশিয়াতে প্রত্যেকটি রিপাব্লিক এক-একটা আলাদা আলাদা দেশ। শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চা আর সব কাজকর্ম চলে স্থানীয় ভাষায়। কন্‌সার্টের নাচ-গানের মধ্যে অধিকাংশই কাজাক ভাষায়। নাচগুলিও বেশির ভাগ কাজাক গ্রামের জিনিস। কিন্তু তার মধ্যে গ্রাম্যতা-দোষ নেই, আছে মার্জিত রুচির পরিচয় আর বৈচিত্র্য। তিন-চার জন নামজাদা গাইয়েকে শ্রোতারা কিছুতেই ছাড়ে না। হাততালি দিয়ে ঘিরিয়ে ফিরিয়ে আনল। যারা অভিনয় করে বা গান করে তাদের সঙ্গে দর্শক ও শ্রোতাদের হৃদয়ের যোগ মস্কৌতেও দেখেছিলুম, এখানেও তাই। এরা আর্টিস্টদের সব দিক দিয়ে উৎসাহ দিতে জানে, উৎসাহ দেয়। Roza Baglanova নামে একটা মেয়ে— বয়স খুবই কম— গান করবার অসাধারণ ক্ষমতা, তাকে একটার জায়গায় ছয় বার ফিরে ডেকে ছটা গান করিয়ে নিলে। ভাষা জানি না, কিন্তু আমরাও মুগ্ধ হয়ে শুনলুম। তার একটা কারণ কাজাক গানের সুর অনেকটা আমাদের দেশের মতো। ঠিক একরকম নয়, কিন্তু একই জাতের— কোথাও মনে হয় যেন ভাটিয়াল সুরের আভাস, কোথাও যেন ভৈরবী।

আল্‌মা-আতায় সিনেমা-স্টুডিয়ো দেখতে গিয়েছিলুম। এখানে সিনেমার জন্তে একটা স্বতন্ত্র বিভাগ আছে, তার জন্ত আলাদা একজন মন্ত্রী। অন্ত অন্ত রিপাব্লিকেও এই ব্যবস্থা। আল্‌মা-আতায় সিনেমা-মন্ত্রী নিজে আমাদের সব দেখিয়ে দিলেন। এখানকার স্টুডিয়ো বছর পাঁচেক আগে স্থাপিত হয়েছে, এখন এখানে কাজ করে আড়াই শ লোক। বছরে এখন কুড়িখানা বড়ো ফিল্ম তৈরি করে— কাজাক দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সাহিত্য, এইসব বিষয় নিয়ে। অন্ত অন্ত রিপাব্লিকে এই ভাবে তাদের নিজেদের ভাষায়, নিজেদের সাহিত্য, দেশ বা জাতির কথা নিয়ে ফিল্ম তৈরি করে। এর মধ্যে

ভালো ভালো ফিল্ম বাছাই করে নিয়ে অন্য রিপাব্লিকের ভাষাতে তর্জমা করা হয়। আল্‌মা-আতা স্টুডিয়োতেও অন্য প্রদেশের ফিল্মের কথা-অংশ তর্জমা করে। এই ভাবে রাশিয়ায় সবগুলি দেশের মধ্যে, ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও, ফিল্মের আদান-প্রদান চলছে। সবই সরকারী। কত কাটতি হবে তার জন্য ভাবনা নেই। ভালো ফিল্ম হলে সারা রাশিয়ায় তার চল হবে।

এখানে আর্টিস্ট ফটোগ্রাফার আর সকলে যারা কাজ করে তারা মাহিনা পায় মোটামুটি মস্কৌরই মতো। তাই বেশি টাকার লোভে নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। নিজের দেশে বসে, নিজের ভাষায় ভালো ফিল্ম তৈরি করতে পারলেই হল। যদি সত্যিই ভালো হয় তবে অন্যসব দেশ থেকে তার চাহিদা হবে। সরকারী হলেও সব জায়গায়ই টাকা দিয়ে ফিল্ম নিতে হয়, টাকা দিয়ে সিনেমা দেখতে হয়। কাজেই লোকের ভালো না লাগলে উপর থেকে ফতোয়া দিয়ে বাজে ফিল্ম চালাবার জো নেই। ভালো ফিল্ম হলে সব দেশেই চলবে। কাজেই আর্টিস্টের পক্ষে টাকায় বা খ্যাতিতে কোনোদিকেই কম পড়বে না। সেই জন্য ছোটো ছোটো প্রদেশেও এরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেদের ভাষায় ফিল্ম তৈরি করার সুযোগ পায়। শুধু ফিল্ম কেন, প্রত্যেকটা দেশ নিজের ভাষায় নিজেদের সাহিত্য, নিজেদের নাচ-গান-সংগীত সব কিছুরই উন্নতি করতে পারে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভালো ভালো জিনিসগুলি সমস্ত রাশিয়াতে ছড়িয়ে যায়।

রাশিয়া থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর দুর্দিন-দুর্ভিক্ষের মধ্যেই এরা নেচেছে, গান গেয়েছে, নাট্যাভিনয় করেছে— এদের ঐতিহাসিক বিরাট নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ ঘটে নি। ... রাশিয়ার নাট্যমঞ্চে যে কলা-সাধনার বিকাশ হয়েছে, সে অসামান্য। তার মধ্যে নূতন সৃষ্টির সাহস ক্রমাগতই দেখা দিচ্ছে। এখনও থামে নি। ওখানকার সমাজবিপ্লবে এই নূতন সৃষ্টিরই অসমসাহস কাজ করেছে। এরা সমাজে রাষ্ট্রে কলাতত্ত্বে কোথাও নূতনকে ভয় করে নি।"[৩]

মস্কৌতে বসেই নানা জায়গার অপেরা নাচগান দেখেছিলুম— য়ুক্রেন, আজারবাইজান, খিরগিজ, বাষ্‌কিরিস্থান, বুরাৎ-মঙ্গোলিয়ান, উজ্‌বেক, তুর্কমেন, ক্যারল-ফিন, আরো কত কী। আল্‌মা-আতায় এসে বুঝতে পারলুম যে, এই বৈচিত্র্যের উৎস এরা ছড়িয়ে দিয়েছে প্রত্যেকটি প্রদেশ ও নেশনের মধ্যে। তাই রাশিয়ায় ললিতকলার নতুন সৃষ্টি চলেছে সমস্ত দেশ জুড়ে।

আল্‌মা-আতায় আমরা দুটো কারখানা দেখতে গিয়েছিলুম। একটা সুতা-তৈরির, আর অন্যটা খুব ভারি সব মেশিন তৈরির। ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আধুনিক। প্রত্যেক কারখানায় ছোটো ছেলেদের জন্য কিণ্ডারগার্টেন, ডিস্‌পেন্সারি, আর পায়োনিয়র্‌স্ ক্যাম্প, কর্মীদের জন্য ডিস্‌পেন্সারি, ছুটির সময়ে বিশ্রামগৃহের ব্যবস্থা। মজুর, ইঞ্জিনিয়র, ম্যানেজার সকলের মাহিনা মোটামুটি মস্কৌরই সমান। প্রত্যেকটি মজুরকে বেশি পরিমাণে ভালো জিনিস তৈরি করার জন্য নানারকমের উৎসাহ দেওয়া হয়। বেশি জিনিস তৈরি করতে পারলে টাকা তো বেশি পাবেই, তা ছাড়া নানারকম সামাজিক সম্মান লাভ হবে। সব উপরে আছে স্টালিন-পুরস্কার, তাতে পঞ্চাশ হাজার বা এক লক্ষ রুবল একসঙ্গে পাওয়া যায়। সব

৩ রাশিয়ার চিঠি। ৩ অক্টোবর ১৯০০

জায়গাতেই দেখলুম প্রত্যেক মানুষকে বলছে, যত পারো বেশি কাজ করো, ভালো করে কাজ করো। সব দিক দিয়ে উন্নতির পথ খোলা রয়েছে।

এদেশে মেয়েরা পঞ্চাশ বছরে আর পুরুষেরা পঞ্চান্ন বছর বয়সে অবসর গ্রহণ ক'রে পেন্সন নিতে পারে। কিন্তু ইচ্ছা করলে সকলেই পেন্সন পাওয়ার পরেও কাজ করে যেতে পারে, তাতে কোনো বাধা নেই। তাতে পুরা মাহিনাও পাবে, পেন্সনও পাবে।

আল্‌মা-আতায় বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেলুম এদের কারখানাগুলি সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে। পথে আসতে আসতে দেখলেম, একেবারে মরুভূমির মতো দেশের মাঝখানে বড়ো বড়ো ফ্যাক্টরি খাড়া করেছে— Akmoliusk, Karaganda, Balkhash এইরকম কত জায়গায় নতুন নতুন শহর গড়ে উঠেছে। প্রত্যেকটা প্রদেশেই শুনলুম এইরকম ব্যবস্থা। সব জায়গাতেই কারখানা-শিল্পের বিস্তার প্রবলবেগে অগ্রসর হচ্ছে। শ্বেত-রাশিয়ার সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই।

লেখায় পড়েছিলুম যে, এদের লক্ষ্য রাশিয়ার সবগুলি দেশ ও জাতির হবে সমান অধিকার। আল্‌মা-আতায় এসে নিজের চোখে দেখলুম যে, এখানকার কাজাক জাতের মানুষগুলি মস্কৌর শ্বেত-রাশিয়ার মানুষদেরই মতো শিক্ষা স্বাস্থ্য ললিত-কলা শিল্প-বাণিজ্য সব বিষয়েই মোটামুটি সমান সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। ঐকান্তিক পার্থক্য কোথাও নেই। শুধু কাজাকদেশ বা আল্‌মা-আতা নয়, অন্যসব দেশ বা রিপাব্লিকেও এই একই ব্যবস্থা। এদের চেষ্টা, সমস্ত বৈষম্য ঘুচিয়ে দিয়ে এদের দেশের নানা বিভিন্ন জাতির মধ্যে এরা সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "কাজ সামান্য নয়। য়ুরোপ-এশিয়া জুড়ে প্রকাণ্ড এদের রাষ্ট্রক্ষেত্র। প্রজামণ্ডলীর মধ্যে যত বিভিন্ন জাতের মানুষ আছে, ভারতবর্ষেও এত নেই। তাদের ভূপ্রকৃতি মানবপ্রকৃতির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য অনেক বেশি। বস্তুত এদের সমস্যা বহুবিচিত্র-জাতি-সমাকীর্ণ, বহুবিচিত্র-অবস্থা-সংকুল বিশ্ব-পৃথিবীরই সমস্যারই সংক্ষিপ্ত রূপ।"[৪]

আল্‌মা-আতায় গিয়ে মনে হল যে, এই নানা বিভিন্নতার মধ্যে সামঞ্জস্য ও ঐক্য স্থাপনের কাজে এরা প্রবল ভাবে অগ্রসর হচ্ছে।

আল্‌মা-আতা শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটা গ্রামে Luchvostoka বা 'পূর্ব-রশ্মি' নামে একটা Kolkhoz বা ঐকত্রিক খেত দেখতে গিয়েছিলুম। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে এর কাজ শুরু হয়। এখন দেড় হাজার পরিবারের ৫১০০ জন লোক মিলে এই ব্যাপার। এদের জমির পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ হেক্টর অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ বিঘা হবে। গম আলু, পেঁয়াজ, রসুন, কপি ও অন্যান্য সব্জির চাষ আছে। গমের খেত দেখলুম বিগন্নবিস্তৃত, কোথায় শেষ হয়েছে বোঝা যায় না। দেখলুম, সাড়ে সাত শ বিঘা জুড়ে একসঙ্গে আলুর খেত। সবই অবশ্য কলের লাঙলে চাষ হয়। বেশির ভাগ অন্যসব কাজও হয় কলে, বৈদ্যুতিক শক্তিতে। এ ছাড়া ফলের বাগান আছে পাঁচ শ। আর গোরু ভেড়া আর ঘোড়া, এইসব পশুশালা। কাজাকদেশটা ঘোড়ার জন্য বিখ্যাত। খুব সুন্দর দেখতে সব ঘোড়া। আর koumis নামে বিখ্যাত ঘোড়ার দুধ দিয়ে তৈরি পাতলা দইয়ের মতন জিনিসও চেখে দেখলুম।

কলগঞ্জের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা মোটামুটি কো-অপারেটিভের মতো। সারা বছরের কাজের উপরে

৪ রাশিয়ার চিঠি। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

খরচ-খরচা বাদে যা লাভ হয় তার খানিকটা অংশ থাকে কলখজের নতুন ঘরবাড়ি তৈরি বা কলকব্জা-সরঞ্জাম কেনবার জন্ত, আর বাকি সমস্ত টাকা ভাগ করে দেওয়া হয় সারা বছরে যে যতটা কাজ করেছে সেই অনুপাতে। খোঁজ নিয়ে জানলুম যে, পুরো কাজ করে এমন লোকের মাসে গড়ে কলখজ থেকে আয় হয় নয় শ বা হাজার রুব্‌ল। কলখজের প্রতি পরিবারে সাধারণত স্বামী আর স্ত্রী দুজনেই কাজ করে থাকে। কাজেই প্রত্যেকটি পরিবারের কলখজ থেকে মাসে আয় হয় আঠারো শ বা দু হাজার রুব্‌ল। এর উপরে প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব বা খাস জমি আছে আধ হেক্টর— প্রায় চার বিঘা; আর প্রায় সকলেই নিজস্ব গোরু-ভেড়াও পালন করে। নিজেদের উৎপন্ন জিনিস ওরা নিজেরাই বিক্রি করে, আর তার থেকেও বেশ খানিকটা রোজগার করে। কাজেই একটা চাষী পরিবারের গড়ে মাসে দু হাজার বা আড়াই হাজার রুব্‌ল আয় হয়। কারখানায় কাজ করে এমন একটা পরিবারের আয়ও এইরকমই। বরং চাষী-পরিবারের অবস্থাই একটু ভালো। চাষীর হাতেই নাকি এখন বেশি পয়সা।

কলখজের শিশুদের জন্ত সাতটা বিদ্যালয় আছে, তার মধ্যে একটাতে ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত পড়ানো হয়, যেমন শহরে। গ্রামেই আছে ডিস্‌পেন্সারি, ছোটো হাসপাতাল। তা ছাড়া কাছেই আল্‌মা-আতা শহর। কিন্তু যেসব গ্রাম শহর থেকে অনেক দূরে তার জন্তেও চিকিৎসার ভালো ব্যবস্থা আছে। মস্কো থেকে আসবার পথে সাত-আটটা এয়ার-পোর্টে দেখলুম অনেক ছোটো ছোটো অ্যাম্বুলেন্স-প্লেন তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলি ওড়ে একটু আস্তে, ঘণ্টায় নব্বই বা এক শ মাইল; আর খুব অল্প জায়গার মধ্যে উঠতে-নামতে পারে। খবর পেলেই এইরকম প্লেনে চড়ে ডাক্তার সুদূর গ্রামে চলে যায়, আর দরকার হলে রুগীকে কাছের কোনো শহরে নিয়ে আসে। সবই সরকারী খরচে। রুগীকে এক পয়সাও দিতে হয় না।

শিক্ষা আর চিকিৎসা সম্বন্ধে দেখলুম গ্রামের লোকেরা ঠিক শহরের লোকের মতই সবরকম সুযোগ-সুবিধা পায়। গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরি তো আছেই। শহরের বড় লাইব্রেরি থেকেও গ্রামে গ্রামে বই পাঠানো হয়। যেমন মস্কোর বিখ্যাত লেনিন লাইব্রেরি থেকে গত বছরে তিন লক্ষ বই বাইরে ডাকে পাঠিয়েছে। এ ছাড়া সরকারী সিনেমা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। শুধু এক কাজাকস্থানেই এই রকম ভ্রাম্যমাণ সিনেমা আছে তিন শ।

কলখজের নানারকম ব্যবস্থা দেখলুম। যেমন নিজেদের ক্লাব। নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে, এখনো ছবি-আঁকা দরজায় রঙ দেওয়া চলছে। বড়ো বড়ো থাম দেওয়া একতলা বাড়ি। সামনের দিকে একটা বড়ো বারান্দা। তার পরে একটা বড়ো ঘর; তাতে চার শ লোক অনায়াসে একত্র হতে পারে। তার পাশে থাটামঞ্চ। থাটানো স্টেজ। অর্কেস্ট্রার জন্ত জায়গা, তাতে পঞ্চাশ জন বাজাবার লোক বসতে পারে। আর পাঁচ শ লোকের জন্ত বসবার আসন। এখানে ওদের অ্যামেচার অভিনয় নাচ গান সংগীত হয়। তা ছাড়া বাইরে থেকে সিনেমা আর নানারকম অপেরা, অভিনয়, গানের দলকে ভাড়া করে নিয়ে আসে। বড়ো বড়ো নামজাদা দলও মাঝে মাঝে এসে থাকে। ক্লাব-বাড়ির সামনে নানারকম খেলার ব্যবস্থা। খোলা আকাশের নীচে নাচবার জন্ত একটা বড় নীচু কাঠের মঞ্চ। এইরকম আরো কত ব্যবস্থা।

দেখলুম যে, শিক্ষা চিকিৎসা আর সংস্কৃতি এই তিন বিষয়ে গ্রামের লোকদের জন্ত শহরের

মতোই ব্যবস্থা করার চেষ্টা। গ্রাম আর শহরের মধ্যে কোনো ঐকান্তিক ভেদ যাতে না থাকে। নতুন শহরগুলির রাস্তায় রাস্তায় থাকবে গাছের সারি আর বাড়িতে থাকবে বাগান, সমস্ত শহর হবে সবুজ। আর অন্যদিকে প্রত্যেক গ্রামেই শিক্ষার ভালো ব্যবস্থা, বিদ্যালয়, লাইব্রেরি। চিকিৎসার ব্যবস্থা, ডিস্পেন্সারি, হাসপাতাল। আর নাচ, গান, সংগীত, অভিনয়, সিনেমা সবই পৌঁছিয়ে দেবে গ্রামের ভিতরে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "বর্তমান যুগের বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী। গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে যে প্রাণের উপাদান তুচ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানবপ্রকৃতিকে কোনোদিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়। রাশিয়ায় দেখেছি গ্রামের সঙ্গে শহরের বৈপরীত্য ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা। এই চেষ্টা যদি ভালো করে সিদ্ধ হয় তা হলে শহরের অস্বাভাবিক অতিবৃদ্ধি নিবারণ হবে। দেশের প্রাণশক্তি চিন্তাশক্তি দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আপন কাজ করতে পারবে।"[৫]

রবীন্দ্রনাথ এই কথা লিখেছিলেন একুশ বছর আগে। সুদূর কাজাকদেশের একটা ছোটো গ্রামে গিয়ে সেদিন স্পষ্ট দেখতে পেলুম যে এদেশে গ্রাম ও শহরের বৈপরীত্য এরা সত্যিই অনেক পরিমাণে ঘুচিয়ে এনেছে। গ্রামের লোকের কাছে সব রকম সুযোগ-সুবিধা এরা পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। গ্রাম ছেড়ে শহরে যাওয়ার জন্য আর এখন এদের লোভ থাকবে না। এই রকম করে এরা গ্রাম ও শহরের সভ্যতাকে মিলিয়ে দেবে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "রাশিয়ার স্মৃতি আজও আমার সমস্ত মন অধিকার করে আছে। তার প্রধান কারণ, অন্যান্য যেসব দেশে ঘুরেছি তারা সমগ্রভাবে মনকে নাড়া দেয় না। তাদের নানা কর্মের উদ্যম আছে আপন আপন মহলে। কোথাও আছে পলিটিক্স, কোথাও আছে হাসপাতাল, কোথাও আছে বিশ্ববিদ্যালয়, কোথাও আছে মিউজিয়ম— বিশেষজ্ঞরা তাই নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে সমস্ত দেশটা এক অভিপ্রায় মনে নিয়ে, সমস্ত কর্মবিভাগকে এক যাদুমালে জড়িত করে, এক বিরাট দেহ, এক বৃহৎ ব্যক্তিরূপ ধারণ করেছে। সব কিছু মিলে গেছে একটি অখণ্ড সাধনার মধ্যে।"[৬]

আল্মা-আতায় গিয়ে মনে হল, রাশিয়ায় নতুন করে সমাজ, নতুন করে দেশকে সৃষ্টি করার এই বিরাট উদ্যম দেখতে পেলেম তার একটা সমগ্র-রূপে। মস্কৌতে ফিরে এসে লেনিন-লাইব্রেরি থেকে ধার করে আনা 'রাশিয়ার চিঠি' আবার পড়লুম, আর বারে বারে মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি। একুশ বছর আগে রাশিয়ায় কাজের সূচনা যখন সবে আরম্ভ হয়েছে বা হয় নি সেই সময়েই তাঁর কবির চোখে ভবিষ্যৎ-রাশিয়ার উজ্জ্বল ছবি কী স্পষ্ট করেই তিনি দেখেছিলেন। একুশ বছর পরে মস্কৌতে বসে বসে বারে বারে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করলুম আর তাঁর চোখের দেখা দিয়ে দেশটাকে দেখতে পেলেম।

মস্কৌ। জুলাই ১৯৫১

৫ রাশিয়ার চিঠি। উপসংহার

৬ রাশিয়ার চিঠি। ৩ অক্টোবর ১৯৩০